একই ব্যক্তি - ইংরেজীতে বলে সি. আর. দাশ বাংলায় বলে মহাত্মা গান্ধী!

॥ শাহ্জাহান কিবরিয়া ॥

সেদিন বৈকালিক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মাত্র ঘর থেকে বেরিয়েছি। গলির মুখে আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকার এবং পাশের বাড়ির কেয়ারটেকার ভীষণ তর্কে লিপ্ত। ওদের একজনের নাম সামাদ, অপরজনের নাম রশিদ। তাদের তর্কের বিষয়, বর্তমান সরকার কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার না অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এরা দু'জনে মোটামুটি শিক্ষিত। নিয়মিত পত্রিকা পড়ে এবং আর পাঁচজন বাঙালির মতো রাজনীতি চর্চা করতে ভালোবাসে।
আমাকে দেখতে পেয়ে তারা বিষয়টির মীমাংসার জন্য আমার শরণাপন্ন হয়।
এ দুটি বিষয় আমি কখনো গভীর ভাবে ভেবে দেখিনি। ওদের আকস্মিক প্রশ্নে অপ্রস্তুত হলাম।
সাধারণ ভাবে আমরা জানি, স্বৈরাচার পতন-পরবর্তী প্রথম নির্বাচিত সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী মাগুরার উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও জালভোটের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ধারণা গড়ে ওঠে। বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রস্তাবিত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। বিএনপি এ দাবির বিরোধিতা করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, 'শিশু আর পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ হয় না।'
অবশেষে ব্যাপক বিক্ষোভের ফলে বিএনপি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।
বিএনপি'র কার্যকাল শেষে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা করে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। তিন মাস স্থায়ী এই সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। বিএনপি নির্বাচনের ব্যাপারে কারচুপির অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতা করে এবং সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এক পর্যায়ে সংসদ অধিবেশন বর্জন করে। আওয়ামী লীগ তার শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী উপজাতীয়দের সাথে শান্তিচুক্তি ও ভারতের সাথে পানি বন্টন চুক্তিসহ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করে। এ সময়ে দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখে এবং খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে দেশে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে সহায়তা করে। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার মোকাবিলা করা এ সরকারের অন্যতম কীর্তি। তবে সরকারী প্রশ্রয়ে সংঘটিত কিছু কিছু সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড যত সীমিতই হোক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির সরকারের কাছে এ জাতীয় কার্যকলাপ কখনো কাম্য নয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের চেয়ে আওয়ামী লীগের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। তাই তাদের ক্ষুদ্র অপরাধও বড় হয়ে দেখা দেয়। শুধু দূরদর্শিতার অভাবে আওয়ামী লীগের সকল অর্জন বিসর্জিত হয়।
আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্তির পর ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে দেশে পুনরায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হন প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান। নির্বাচনে বিএনপিসহ চারদলীয় ঐক্যজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ এনে তার বিরোধিতা করে।
বিএনপি জামাত সমর্থিত চারদলীয় ঐক্যজোটের শাসনামলের শুরু থেকে দেশব্যাপী শুরু হয় লাগামহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটতরাজ, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, অবৈধ ভূমি দখল, চর দখল, বন উজাড়, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি প্রভৃতি। এছাড়া প্রশাসন, শিক্ষা, পুলিশ ও বিচার বিভাগসহ সকল প্রতিষ্ঠানকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে দেশকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। সরকারী সহযোগিতায় ইসলামী জঙ্গিরা দেশে হত্যাকান্ড শুরু করে ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট সন্ত্রাসীরা আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালায়। বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেও আওয়ামী মহিলা লীগের সভানেত্রী আইভী রহমান সহ ২৪ জন নেতা ও কর্মী নিহত হন এবং আহত হন দুই শতাধিক। এছাড়া প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য এস এস এম কিবরিয়া এবং সংসদ সদস্য আহ্সান উল্লাহ্ মাস্টারসহ বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। এসব হত্যাকান্ডের বিচারের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বাংলাদেশের এই অরাজক পরিস্থিতি বিষয়ে দেশী, বিদেশী পত্রিকায় অনেক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ সরকারের আমলে বাংলাদেশ বিশ্বে দুর্নীতিতে চারবার শীর্ষ স্থান দখল করে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ধ্বংস করে। ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে বিদেশে বাংলাদেশ পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, 'চড়বিৎ পড়ৎৎঁঢ়ঃং, ধনংড়ষঁঃব ঢ়ড়বিৎ পড়ৎৎঁঢ়ঃং ধনংড়ষঁঃবষু.' জোট সরকারের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তার প্রমাণ মেলে।
আওয়ামী লীগ জোট সরকারের এসব অপকর্মের বিরোধিতা করে এবং এক পর্যায়ে সরকার পতনের দাবিতে সংসদ বর্জন করে আন্দোলন শুরু করে। মেয়াদ পূর্তির পর বিএনপি জোট সরকার পদত্যাগ করে। নানান টালবাহানার পর বিএনপি মনোনীত রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদকে অবৈধভাবে প্রধান উপদেষ্টা করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। ইতোপূর্বে জোট সরকার ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনে বিতর্কিত প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ পছন্দ মাফিক অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করে এবং সকল জেলা ও উপজেলার দলীয় ইলেকশন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।
রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদের অবৈধ কর্মকান্ডের প্রতিবাদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৪ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। আসন্ন নির্বাচনে বিএনপিসহ চারদলীয় ঐক্যজোটের ব্যাপক কারচুপির প্রস্তুতির আভাস পেয়ে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলীয় ঐক্যজোট ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করে। প্রকাশ্য রাজপথে লাঠি, বৈঠা ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। এ সময় একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে 'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী' বলে উস্কানীমূলক শ্লোগান দিতে দেখা যায়। দাঙ্গায় বহু লোক হতাহত হয়।
দেশ যখন একটি গৃহযুদ্ধের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছিলো তখন ১১ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ ত্যাগ করেন। তার সাথে অন্যান্য উপদেষ্টারাও বিদায় নেন। একই দিন ড. ফখরুদ্দিন আহমদকে প্রধান উপদেষ্টাকরে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার কার্যক্রম পরিচালিত করতে থাকে। দেশবাসী সেনাবাহিনীসহ এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে স্বাগত জানায় এবং তাদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করে। দেশ একটি আসন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।
সংবিধান মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকাল সাধারণভাবে তিন মাস বলে আমরা জানি। এই তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তারা বিদায় নেবেন।
বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকাল ইতোমধ্যে ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরবর্তী সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে পারবেন। এতে আইনগত কোনো অসুবিধা নেই।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার কী সেটা মোটামুটি আমি বুঝি। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কে আমার বিশেষ কোনো ধারণা নেই। এমন কি এই দুই

সরকারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য কি তাও আমি জানি না। অথচ এই দুই কেয়ারটেকারের কাছে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতেও সংকোচ হয়!
হঠাৎ ছোটবেলায় আমার এক শিক্ষকের কাছে শোনা একটি গল্প মনে পড়লো। দেশে তখন ইংরেজ বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন চলছে। ভারত উপমহাদেশের আপামর জনসাধারণ ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। একদিন দুই গাড়োয়ান বসে রাজনীতি নিয়ে আলাপ করছিলো (তখন দেশে ব্যাপক ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন ছিলো)। এক গাড়োয়ান অপর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করে, ‘আচ্ছা ভাই, সবাই মহাত্মা গান্ধী এবং সি. আর. দাশ বলে চেঁচায়। এরা আসলে কে?’
অপর গাড়োয়ান বিজ্ঞের মতো জবাব দেয়, ‘আরে আহাম্মক তাও জানিস না? ওরা দু’জন একই ব্যক্তি। ইংরেজীতে বলে সি. আর. দাশ এবং বাংলায় বলে মহাত্মা গান্ধী।’
সেকথা স্মরণ হতেই কেয়ারটেকার দু’জনকে বললাম, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলে আলাদা কিছু নেই। সরকার বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আর জনগণ বলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। উভয় সরকারই এক। ❑